বাঙালি মুসলিম সমাজ - একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মদ আফসার আলী
প্রাবন্ধিক

মনস্তত্ত্ব কথাটির অর্থ হল আচরন বা ব্যবহার অধ্যয়নের বিজ্ঞান। এটি ব্যক্তির মানসিক ও প্রক্ষোবিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। আবার, প্রক্ষোব বলতে বোঝায় কোনো কিছুর অভাব বা প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে ব্যক্তির মনের ভিতরের ক্ষুধা বা চাহিদা জনিত তাড়না বা শক্তি। এই শক্তি ব্যক্তিকে ততক্ষণ তাড়িত করে যতক্ষণ না সেই অভাব বা প্রয়োজনটি মিটে। সুতরাং, প্রক্ষোব মানুষের ভালো কিছু করার বা উত্তরণের একটি অপরিহার্য চালিকা শক্তি। ব্যক্তি যতক্ষণ না ভালো জায়গায় পৌছানোর প্রয়োজন বোধ করছেন ততক্ষণ তার মধ্যে ভালো কিছু করার ইচ্ছা বা শক্তি জন্মাবে না। ফলে, ভালো কিছু তার দ্বারা হবেও না। সুতরাং, বলতে বাঁধা নেই – যে ব্যক্তি, সমাজ বা সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নতি করার আধ্যন্তরিন তাড়না বা ক্ষুধা অর্থাৎ প্রক্ষোব নেই, সে ব্যক্তি, সমাজ বা সম্প্রদায় কখনও উন্নতি করতে পারে না। বাঙালি মুসলিম সমাজের অনুন্নতি ও প্রক্ষোবের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

একটি জাতির মনস্তত্ত্ব গঠনে সেই জাতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতির পূর্বপুরূষদের মানসিক গঠন যেরূপ ছিল, উত্তর পুরূষদের মানসিক গঠনে সেটার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকবেই। অর্থাৎ, পূর্বপুরূষদের শৌর্য্য-বীর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তির কিছু না কিছু ধারা বংশপরম্পরায় রক্তের মাধ্যমে উত্তর পুরূষদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। পূর্বপুরূষদের বীরত্ব ও সাফল্যপূর্ণ ইতিহাস যেমন উত্তর পুরূষদের গর্বিত করে ও প্রেরণা যোগায়, উন্নত ও বীরত্বপূর্ণ জীবনে উত্তরণের জন্য; তেমনি সম্প্রদায় বা জাতির দাসত্ব ও হীনমণ্যতার ইতিহাস উত্তর পুরূষদের লজ্জিত করে, মাথা নত করে মানবেতর জীবনে চালিত করে। সুতরাং, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্ব গঠনে, উন্নত বা অবনত জীবনের দিতে পরিচালিত করতে।

বাঙালি মুসলিম সমাজের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট খুব গৌরবোজ্জ্বল নয়। জাত-পাতের বৈষম্যে জর্জরিত বাহ্মণ্যবাদের "স্বর্ণযুগ" গুপ্ত সাম্রাজ্য (৩২০–৫৫০ খৃষ্টাব্দ) থেকে ভারতীয় হিন্দু (আসলে ব্রাহ্মণ্য) সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের (তথাকথিত 'নীচু জাতের') মানুষেরা শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচারে অসহায়, দীশেহারা অবস্থায় মানবেতর অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে, এই

উপমহাদেশেরই পশ্চিমে, আরব দেশে বিশুদ্ধ সমাজবাদ ও খাঁটি সাম্যবাদের বাস্তব জীবন-দর্শন, ইসলাম উৎসারিত হয় (৬১০ খৃ.) এবং তার আলোকচ্ছটা বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ও প্রান্তে যেমন ছড়াতে শুরু করে – আমাদের দেশেও তার উদ্ভাষিত কিরণ এসে পৌঁছায়। প্রথমে আরব সাগর সংলগ্ন মালাবার উপকূলে ইসলাম এসে পৌঁছায়। আমাদের বঙ্গ প্রদেশে পৌঁছায় কিছুটা পরে, ১০০০ খৃষ্টাব্দের পরে। তখন, চরম অসাম্যের ব্রাহ্মণ্যবাদে নির্যাতিত হিন্দু ধর্মের তথাকথিত 'নিচু জাতের' মানুষেরা (শূদ্র, চণ্ডাল, অতিশূদ্র /নমঃশূদ্র) দল বেঁধে ইসলামের সমতার, মানবতার ছাতাতলে চলে আসেন – হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে যান। আজকের বাঙালি মুসলমানরা মূলতঃ তাঁদেরই উত্তরসূরী।

হাজার হাজার বছর ধরে দাসত্ব, নির্যাতন, হীনমণ্যতায় শৃঙ্খলিত মন-মানসিকতায় গঠিত হয়েছে তাঁদের মানসিক কাঠামো, চাওয়া-পাওয়া-প্রত্যাশার শংকীর্ণ সীমা-পরিসীমা, ক্ষুদ্র গণ্ডির জগৎ। তাঁরা বড়ো স্বপ্ন, বড়ো হওয়ার স্বপ্ন হাজার হাজার বছর ধরে দেখেন নি – দেখার সাহস পান নি। এমনকী বাঁচার স্বপ্নও তাঁদের দেখার স্পর্ধা ছিল না – তাঁরা শুধু টিঁকে থাকতে ঈশ্বর প্রদত্ত জীবনীশক্তি খরচ করেছেন; বাঁচার ইচ্ছা করতে ভয় পেয়েছে। প্রত্যাশিতভাবেই, সেই "নিচু জাতি" থেকে ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমানরা বংশানুক্রমিকভাবে হাজার হাজার বছর ধরে দাসত্ব, হীনমণ্যতা ও শংকীর্ণ চিন্তা-ভাবনার শিকার – তাতেই তাঁরা অভ্যস্থ, 'স্বাচ্ছ্যন্দ'! তাঁরা খুবই নিম্ন স্তরের চিন্তা-ভাবনা ধারন ও বহন করে চলেছেন। তাঁদের জীবনের প্রত্যাশা খুবই স্বল্প, বাঁচার বড়ো বা মহৎ কোনো লক্ষ্য নেই - বললেই চলে। কেন বেঁচে আছি? – জানি না! বাঁচার জন্য খাচ্ছি, না খাওয়ার জন্য বাঁচছি? – তাও জানি না! – এরূপ জীবন-দর্শনের অধিকারী কোনো ব্যক্তি বা সমাজের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না। সেই কারণে, ব্যতিক্রম ছাড়া, বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে মহৎ চিন্তা করার, উন্নতি করার বা সমাজের উপরের দিকে উঠে আসার ক্ষুধা বা তাড়না প্রায় নেই বললেই চলে।

তাঁদের প্রক্ষোব বা আভ্যন্তরিন তাড়না সম্পূর্ণভাবে নেই, বললে ভুল হবে। তাঁদের তাড়না আছে, কিন্তু সেটা উন্নতির জন্য খুবই ক;, দায়িত্বজ্ঞানহীন, হুজুগি কর্মকান্ডের প্রতি বেশি তাড়না আছে। তাঁদের মধ্যে শিক্ষার মারাত্মক অভাব থাকায় জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে নি। ফলে ভালো-মন্দ, সঠিক-বেঠিক, সুপথ-বিপথ, উন্নতি-অবনতির পার্থক্য ঠিকমতো করতে পারেন না। তাই, উন্নত শিক্ষায় যে সম্মানের জীবন যাপনের, উত্তরণের একমাত্র পথ – সেকথা তাঁরা মানতে নারাজ। তাই শিক্ষার প্রতি মনোভাব খুবই কম, খারাপ বা নেই। সন্তানের ভালো শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যায় করতে চান না। আবার, নিজেদের শিক্ষার অভাবে জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে অস্বচ্ছ ধারনায়

বিভ্রান্ত থাকায় অপ্রয়োজনীয় বা ফাল্তু খরচ, লোক দেখানো খরচ, অপরিকল্পিত খরচ এবং অদূরদর্শী খরচ ও কর্মকান্ডে নিজেকে নিঃস্ব করতে অতি উৎসাহিত! যেমন, যে সন্তানের আকিকা বা খতনায় লাখ টাকা অনায়াসে খরচ করে ভোজ করেন, সেই সন্তানের স্কুলের বেতন বা বই কেনার জন্য "টাকা নেই", "কোথায় পাবো", "আমরা গরিব মানুষ", ... ইত্যাদি জনপ্রিয় ডায়লগ-এর আড়ালে সন্তানের ভবিষ্যৎকে কবর দেন। তাঁরা লোক দেখানো, ফাল্তু খরচের জন্য প্রয়োজনে সুদখোর মহাজনের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে বংশানুক্রমিক ঋণ-দাসে পরিণত হন, স্বাচ্ছন্দে নিজের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আশা-আকাঙ্খা ও জীবনকেও বিক্রি করে দেন – কিন্তু বাড়িতে গচ্ছিত টাকা সন্তানের শিক্ষার জন্য বের করেন না, জমি কেনার জন্য যত্নে পুটলি বেঁধে রাখেন! – এ জাতির না বর্তমান আছে, না ভবিষ্যৎ!

শিক্ষার অভাবে তাঁদের জীবন ও সমাজ-সভ্যতা সম্বন্ধে অপরিষ্কার, ভুল বা ভাসাভাসা জ্ঞান রয়েছে। তাঁদের জীবনের লক্ষ্য বলে তেমন কিছু নেই! তাই, তাঁদের কর্মকান্ড কোনো নির্দিষ্ট্য লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয়। কোনো নির্দিষ্ট্য বড়ো কিছু অর্জন করার জন্য একাগ্রতা সহকারে মন-প্রাণ দিয়ে লেগে থাকার চারিত্রিক দৃঢ়তা এরূপ ব্যক্তি বা সমাজের মধ্যে খুবই কম দেখা যায়। তাই, এদের অর্জনের বা সফলতার খতিয়ানও দেখার মতো কিছু নেই। কারণ, সফলতা বা বড়ো কিছু অর্জন তো ভাসাভাসা ভাবে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছাড়া দায়সারা গোছের কাজ করে আসে না। ফলে, সফলতার খতিয়ান ইনাদের প্রায় শূন্য! উত্তরণের সিঁড়িও ইনাদের অদেখা! ব্যর্থতাই তাঁদের ফসল! সঙ্গে নিয়ে আসে ক্ষতি। অতি কষ্টার্জিত অর্থ - যৎসামান্য সম্পদ, যদিকিছু থেকে থাকে, তা হয় অপচয়। বিকাশের পথ থেকে অনেক দূরে ইনারা। জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিহীন পথে চলে কেউ সফলতা পেতে পারে না, মানুষ হিসাবে বাঁচতে পারে না, বাঙালি মুসলিমরাও তাই পারে নি। নিজের জীবনের যাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের সমাজেরও কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ঠিক করতে পারেন নি। তাই, বাঙালি মুসলিম সমাজ উত্তরণের মুখ তো দেখেই নি – এখন দিশাহীন, বিভ্রান্ত!

এই জ্ঞানহীনতা, বিভ্রান্তি ও দিশাহীনতার সুযোগে প্রধান দুই ধরনের লোকেরা বাঙালি মুসলিম সমাজকে শোষণ ও অপব্যবহার করে। একটি হল তাদের নিজেদের সমাজের বা পাড়ার তথাকথিত ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং অপরটি হল দেশের রাজনৈতিক নৈতৃত্ব। ধর্মীয় নৈতৃত্ব দানকারি ঈমাম বা মৌলানাদের অধিকাংশই ইসলামের সঠিক জ্ঞান রাখেন না। ফলস্বরূপ, তাঁরা অশিক্ষিত বা কম শিক্ষিত বাঙালি মুসলিমদেরকে ধর্মের দোহায় দিয়ে শোষণ ও আরও বিভ্রান্ত করেন। নিজেদের

জ্ঞানের অভাবে সাধারণ মুসলমান এরূপ ধর্মীয় নেতাদের ভণ্ডামি ও শোষণের জাল বুঝতে পারেন না – বরং সানন্দে আল্লাহর নির্দেশ মনে করে শোষণ ও বিভ্রান্তি উপভোগ করেন! এর ফলে তাঁরা আর্থিক ও শিক্ষার দিক দিয়ে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয় – চেতনার দিক দিয়ে নিঃস্ব। অপরদিকে শিক্ষিত চালাক ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলি তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে এরূপ বিভ্রান্ত বাঙালি মুসলিমদেরকে ব্যবহার করে – প্রধানতঃ ভোট বাড়াতে, ভির জমাতে, ভয় দেখাতে, ব্রিগেড ভরাতে এবং সবচেয়ে বেশি পেশী-শক্তি হিসাবে। ফলস্বরূপ, ভোট-যুদ্ধ বা খেলা শেষে বাঙালি মুসলিম পুরুষদের ঠিকানা হয় জেলে, হাসপাতালে, না হলে কবরোস্থানে; মেয়রা হয় বিধবা, নয়তো সন্তানহারা; শিশুরা অনাথ, পথশিশু!

রাজনৈতিক নেতা (ব্যতিক্রম ছাড়া) ও গ্রামের /পাড়ার মাতব্বর মড়োল গোছের কিছু সামাজির পরজীবী রয়েছে যারা অল্প বা অর্ধশিক্ষিত হয়ে ইনাদের উপরে ছড়ি ঘোড়ায়। এই অশিক্ষিত ও বিভ্রান্ত মানুষদেরকে সকল প্রকারে শোষণ করেন। এই পরজীবীরা মূলতঃ স্থানীয় থানার দালাল। যে ব্যক্তিই এদের শোষণের জালে ধরা দেয় না, তাদের মাতব্বরি /অন্যায় মড়োলগিড়ি মেনে নিতে চায় না – তাদেরকে মিথ্যা মামলায়, থানা-পুলিশে জড়িয়ে দিয়ে আরোও বেশি শোষণের পথ নিশ্চিত ও দীর্ঘায়িত করে দেয়। অনেক সময় ঘঁটি-বাটি, মান-সম্মান বিক্রি করিয়ে ছাড়ে!

শিক্ষিত ব্যক্তি আলোক-দিশারী, স্বাভাবিক নেতা। কিন্তু সমাজে দু'একজন শিক্ষিত ব্যক্তি থাকলেও, সমাজের বাকিদের শিক্ষা নেই, বলে শিক্ষার ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মর্যাদা বোঝেন না। তাঁরা শিক্ষিত, জ্ঞানীদের এড়িয়ে চলেন। ফলে, সমাজের গুঁটিকয় বিকশিত মানব-সম্পদের (শিক্ষিত ব্যক্তির) লাভ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন, জ্ঞানীদের উদার দূরদর্শিতাপূর্ণ সদুপদেশ থেকে তাঁরা লাভবান হতে পারেন না। - ব্যর্থতার, গোলামীর গোলোকধাঁধায় আবর্তিত হতেই থাকেন .....।

এই সমাজের বর্তমান গোলামির নাগ-পাশ থেকে বেরোনোর ও উত্তরণের একমাত্র সিঁড়ি হল শিক্ষা-অর্জন, উন্নত শিক্ষা। এর ফলে চেতনা আসবে; জীবন ও সমাজকে সঠিকভাবে নিজে বুঝবে। ছড়িয়ে পরবে অরাজনৈতিক চেতনার বিপ্লব। শিক্ষা বিপ্লব অনেকদূর এগিয়ে গেলেই এই বিপ্লব আসবে। তখন জনগণ গণতন্ত্রে ঐক্যের ভূমিকা ও অপরিহাযর্তা অনুধাবণ করতে পারবে। অরাজনৈতিক একতার হাত ধরে দ্রুত তাঁদের রাজনৈতিক একতা প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং, বাঁচার একটিমাত্র পথ হল – শিক্ষা বিপ্লব ও চেতনার বিপ্লব।